Vol. 49 | No. 2 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সিকান্দার আবু জাফর : প্রসন্ন প্রহরে বিষণ্ন স্বদেশ

Volume	49
Issue	2
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	তারেক রেজা
Published online	February 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v49i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i2.5
Pages	৬৯-৮৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

নজরুল প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম

Check for updates

নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬) যখন বাক্‌রুদ্ধ, অর্থাৎ অসুস্থ হয়ে গেলেন, তার কিছুকাল পরে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮–১৯৭৪) তাঁর *কবিতা* পত্রের একটি 'নজরুল সংখ্যা' বের করেন।[১] তাতে 'নজরুল ইসলাম' নামে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। সম্ভবত, সেটা ছিল নজরুল সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর প্রথম নজরুল-মূল্যায়ন। আর যাঁরা ওই সংখ্যায় লিখেছিলেন, তাঁরা হলেন : নলিনীকান্ত সরকার, জীবনানন্দ দাশ, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, লীলাময় রায় ও আনওয়ারুল ইসলাম প্রমুখ।

কবিতায় যেভাবে বেরিয়েছিল, কোনো পরিবর্তন-সংযোজন ছাড়াই নজরুল সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর উল্লিখিত প্রবন্ধটি পরে তাঁর *কালের পুতুল* (১৯৪৬) গ্রন্থে সংকলিত হয়। এরপরে বুদ্ধদেব বসু বাংলা-ইংরেজি যেখানেই নজরুলের নাম উল্লেখ করেছেন, সর্বত্রই ঐ প্রবন্ধের বক্তব্য ঘুরে-ফিরে এসেছে। প্রথম আলোচনায় তিনি নজরুল সম্পর্কে যে-সব মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তারপর দেখা যায়, নজরুল সম্পর্কে তাঁর মত আর পরিবর্তিত হয়নি, বরঞ্চ নজরুলের কাব্য-সংগীত বিচারে তিনি যেন আরো কঠোর হয়েছেন।

কবিতার নজরুল-সংখ্যা বের করার তাৎপর্য ছিল। সময়টা দুই মহাযুদ্ধের উন্মত্ততায় অস্থির। রাজনীতির বিক্ষুব্ধতা কেবল নেতা-কর্মীদেরই নয়, কবি-সাহিত্যিকদেরও অভিভূত করে তুলেছিল। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, বাংলাদেশে নজরুল ইসলাম সাহিত্যের ক্ষেত্রে, এই অনভিপ্রেত সাময়িক উত্তেজনার প্রথম শিকার হয়েছেন। তাতে তাঁর সাহিত্য মার খেয়েছে, সাহিত্যের আবেদন যে চিরকালের মানুষের হৃদয়ে, যে-হৃদয় দখল করতে পারে কেবল বিশুদ্ধ শিল্প, সেই বিশুদ্ধ শিল্পের উচ্চমঞ্চ থেকে তাঁর পদস্খলন হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর কথা এ রকম :

> আজকাল যে-সব রচনা রাজনৈতিক কবিতা ব'লে আমাদের কাছে ধরা হয়, তার ধূসর নীরবতার সঙ্গে নজরুলের উদ্দীপ্ত আনন্দের প্রতিতুলনা সহজেই মনে জাগে। [...] আজকাল যে-সাম্যের বাণী লোকের মুখে মুখে বুলিতে পরিণত হয়েছে, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নজরুলই তার প্রথম উদ্গাতা। রাজনীতিকে তিনি এড়িয়ে চলেননি তার মধ্যে নিজেকে হারিয়েও ফেলেননি — তা থেকে বের করেছেন সুর-ঝঙ্কার, এবং সেটাই তো কবির কাজ। [বসু, ১৩৫১ : ৪৩]

শেষোক্ত বাক্যটি তিনি লিখেছেন বটে, কিন্তু তিনি নজরুলকে উদাহরণ হিসেবে টেনে এনে অন্যদের সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, 'দুর্দিনের চরমেও সকল দেশেই এমন কিছু-কিছু লোক নিশ্চয়ই থাকবেন যাঁরা সাময়িক উত্তেজনায় উন্মত্ত না-হয়ে একাগ্রচিত্তে শিল্পকলা জ্ঞান-

---

* সহ-পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আপন-আপন কাজ ক'রে যাবেন, দেশের সর্বব্যাপী অসুস্থতার মধ্যে সত্যের শিখাটুকুকে তাঁরাই জ্বালিয়ে রাখবেন আপন প্রাণ দিয়ে, দুর্দিনের অবসানে দেখা যাবে যে সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁরাই।' [বসু, ১৩৫১ : ৪২]

নজরুল বিষয়ে তথাকথিত গবেষণার শেষ নেই। তাঁর তথাকথিত গুণগ্রাহীরও অভাব নেই। বুদ্ধদেব বসুর বেলায়ও একথা প্রায় প্রযোজ্য। কিন্তু এই দুই কবির প্রতি যথার্থ ভালোবাসা আছে, তেমন গবেষক অতি অল্প। ফলে বুদ্ধদেব বসুর নজরুল-চর্চার স্বরূপ কী ছিল সেটা দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব প্রায় অবহেলিত থেকে গেছে। দেখে-শুনে মনে হয়, নজরুল সম্পর্কে বুদ্ধদেব যা-কিছু বলেছেন, তার সবই সত্য, অকাট্য, অতএব প্রামাণ্য।

নজরুল যতদিন সুস্থ ছিলেন, কাব্য-সংগীত স্রষ্টা হিসেবে সক্রিয় ছিলেন, ততদিন তাঁর বন্ধু এবং বিরুদ্ধ শক্তির অভাব হয়নি। তবে নজরুলের চরিত্রে এমন কতকগুলো আকর্ষণীয় মানবিক-গুণ ছিল, যার-জন্য তাঁর সান্নিধ্য যিনি পেয়েছেন, তিনিই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। নজরুল-দর্শনে বুদ্ধদেব বসুর মুগ্ধতাও এর ব্যতিক্রম নয়।

উল্লিখিত প্রবন্ধ ছাড়াও বুদ্ধদেব বসু তাঁর অনেক গ্রন্থে, বিভিন্ন সময়ে, নানা প্রসঙ্গে নজরুল সম্পর্কে মুগ্ধতা এবং বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। সে সব কী এবং কেন, এ-দুয়েরই একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সেজন্য, প্রথমে আমরা বুদ্ধদেব বসুর নজরুল-সম্পর্কিত বক্তব্যের একটা সারসংক্ষেপ, কিন্তু প্রধান অংশ, পাঠকদের সামনে উপস্থিত করব। এবং ফাঁক-ভরাবার জন্য দু-একটা জিজ্ঞাসা ও কিছু বিবেচনা তার সঙ্গে যোগ করব। বুদ্ধদেব বসুর সব কথারই অনুপুঙ্খ বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এখানে তা সম্ভবও নয়।

২

বুদ্ধদেব বসু নজরুলের সমকালীন ছিলেন। তিনি কাছে থেকে নজরুলকে দেখেছেন, জেনেছেন। নজরুলকে প্রথম দেখেই তাঁর প্রতি তিনি মুগ্ধচিত্তে 'প্রেমে পড়ে'ন। সে স্মৃতি বুদ্ধদেব তাঁর বিভিন্ন লেখায় উল্লেখ করেন। তাঁর সে-সব স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন যদি একসঙ্গে উপস্থিত করা যায়, তবে তাঁর পুরো বক্তব্যটা বুঝতে সহজ হয়।

আমার যৌবন গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু নজরুল সম্পর্কে যে-সব কথা বলেছেন, তা আবেগদীপ্ত, উষ্ণ-অভিজ্ঞতায় ঠাসা। তিনি লিখেছেন :

> সেই আমি প্রথম দেখলাম নজরুলকে, অন্য অনেক অসংখ্যের মতই দেখামাত্র প্রেমে পড়ে' গেলাম। চওড়া কাঁধে বলিষ্ঠ তাঁর দেহ, মাঝখান দিয়ে সোজা-সিঁথি-করা কোঁকড়া চুল গ্রীবা ছাপিয়ে প্লাবিত, মুখখানা বড়ো ও গোলছাঁদের নেত্র আয়ত ও কোণরক্তিম। গায়ে গেরুয়া রঙের খদ্দর পাঞ্জাবি, কাঁধে সূর্যমুখী হলুদ চাদর। কণ্ঠে তাঁর হাসি, কণ্ঠে তাঁর গান, প্রাণে তাঁর অফুরান আনন্দ — সবমিলিয়ে মনোলুণ্ঠনকারী একটি মানুষ। [বসু, ২০০৯ : ৭০]

কবিতা পত্রে বুদ্ধদেব যে প্রবন্ধ লেখেন, তাতে ব্যক্তি-নজরুলের যে-বর্ণনা দেন, তা আরো বিশেষভাবে উপভোগ্য :

> বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে একটি মুসলমান অধ্যাপকের বাসা, সেখান থেকে নজরুলকে ছিনিয়ে আমরা কয়েকটি উৎসাহী যুবক চলেছি আমাদের প্রগতির আড্ডায়। বিকেলের ঝকমকে রোদ্দুর, সবুজ রমনা জ্বলছে। হেঁটেই চলেছি আমরা, কেউ-কেউ বাইসাইকেলটিকে হাতে ধ'রে ঠেলে-ঠেলে নিয়ে চলেছে, জনবিরল সুন্দর পথ আমাদের কলরবে মুখর, নজরুল একাই একশো, চওড়া মজবুত জোরালো তাঁর শরীর, বড়ো বড়ো লাল-ছিটে-লাগা মদির তাঁর চোখ, মনোহর মুখশ্রী, লম্বা-লম্বা ঝাঁকড়া চুল তাঁর প্রাণের ফূর্তির মতোই অবাধ্য, গায়ে হলদে কিংবা কমলা রঙের চাদর — দুটোই খদ্দরের। 'রঙিন জামা পরেন কেন?' 'সভায় অনেক লোকের মধ্যে চট ক'রে চোখে পড়ে তাই।' ব'লে ভাঙা-ভাঙা গলায় হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। [বসু, ১৩৫১ : ১৮-১৯]

নজরুলকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা তাঁর বাহ্যিক গড়ন ও পোশাক-আশাকের যে-রকম বর্ণনা দিয়েছেন, বুদ্ধদেব বসুর এ বর্ণনা সেই বহু-অনেকের মতোই আকর্ষণীয় এবং মনোলোভা নিঃসন্দেহে। মানুষের সঙ্গে — বিদ্যাবুদ্ধির জোরে নয় — শুধু মানবিক কারণেই যুক্ত হতে পারাটা যে কী আনন্দের — তার তুলনা অন্য কিছুতে মেলে না। কেননা সে যোগ যেখানে ঘটে, সেখানে সবই সহজ — সবই আনন্দ আর সুন্দর হয়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে — সব গোষ্ঠী ও শ্রেণির মধ্যে একাধারে বুদ্ধিমান ও সহৃদয় মানুষ পাওয়া সহজ নয়; আর সেরকম মানুষ পাওয়া গেলে, তবেই বলা যায়, সে-যোগ অপূর্ব। কিন্তু বুদ্ধদেবের মন্তব্য :

> এমন উদ্দাম প্রাণশক্তি কোনো মানুষের আমি দেখিনি। দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময় উছলে পড়ছে তাঁর প্রাণ। কাছাকাছি সকলকেই উজ্জীবিত ক'রে, মনের যত ময়লা, যত খেদ, যত গ্লানি সব ভাসিয়ে দিয়ে। সকল লোকই তাঁর আপন, সব বাড়িই তাঁর নিজের বাড়ি। শ্রীকৃষ্ণের মতো, তিনি যখন যার তখন তার। জোর ক'রে একবার ধ'রে আনতে পারলে নিশ্চিন্ত, আর ওঠবার নাম করবেন না — বড়ো-বড়ো জরুরি এনগেজমেন্ট ভেসে যাবে। ঝোঁকে প'ড়ে, দলে প'ড়ে, সবই করতে পারেন।...
>
> সাংসারিক দিক থেকে এ-চরিত্র আদর্শ নয়, কিন্তু এ-চরিত্রে রম্যতা আছে তাতে সন্দেহ কী। সেকালে বোহিমিয়ানের চালচলন অনেকেই রপ্ত করেছিলেন — মনে-মনে তাঁদের হিশেবের খাতায় ভুল ছিলো না — জাত বোহিমিয়ান এক নজরুল ইসলামকেই দেখেছি। অপরূপ তাঁর দায়িত্বহীনতা। [বসু, ১৩৫১ : ১৯]

নজরুল 'দায়িত্বহীন' ছিলেন, কথাটা এই প্রথম বুদ্ধদেব বসুর মুখে শোনা গেল। কিন্তু প্রমাণ ছাড়াই। একটা দায়িত্ব নজরুল কাঁধে নিয়েছিলেন। সকলেই নতমস্তকে মেনেছেন, সে-দায়িত্ব তিনি মনে-প্রাণে পালন করেছেন। কেননা মানুষের জীবনে দায়িত্ব ভিন্ন কোনো রকম সার্থকতা নেই। নজরুল এই দায়িত্বের মূল্য বুঝতেন, জীবনে এটা কোনোদিন ভোলেননি। এজন্যে দেশের লোক তাঁকে হৃদয়ে আসন-পেতে দিয়েছে। তাঁর অমরত্বটা, খ্যাতিটা সেখানেই।

সাংসারিক হিসাবে নজরুল আদর্শ না-হতে পারেন, ক-জনই বা তা হয়। কিন্তু তা-যে 'অপরূপ'ভাবে নজরুল অবহেলা করেছেন, এমন তো শোনা যায়নি! ব্যক্তি-নজরুল সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর এই বিচার সম্ভবত চরম বিচার। 'বোহিমিয়ানা' যে মানুষের স্বভাবগত, তার সমালোচনা বৃথা। তারপরও ব্যাপারটা জেনে-বুঝে কেউ যদি তাকে অবজ্ঞা করেন, তবে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত সীমানার মধ্যে রাখা ভালো।

৩

বুদ্ধদেব বসু স্বীকার করেছেন যে, নজরুল-কাব্যের একটা ইতিহাস আছে। সেটা এই যে, 'রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলাভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি।' [বসু, ১৩৬১ : ১৪৫]। কোন্ দিক থেকে? 'সত্যেন্দ্রনাথ, শিল্পিতার দিক থেকে, অন্তত তাঁর সমকক্ষ, সত্যেন্দ্রনাথে বৈচিত্র্যও কিছু বেশি; কিন্তু এ-দু'জন কবিতে পার্থক্য এই যে সত্যেন্দ্রনাথকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথেরই সংলগ্ন কিংবা অন্তর্গত, আর নজরুল ইসলামকে রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য একজন কবি — ক্ষুদ্রতর নিশ্চয়ই, কিন্তু নতুন।' [বসু, ১৩৬১ : ১৪৫]। বুদ্ধদেবের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন-যুগের সূচনা হলো, এবং সেটা সাহিত্যের ইতিহাসে বিপ্লবেরই শামিল। কিন্তু এই যে বিপ্লব, যার স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধদেব অকুণ্ঠ মনে স্বীকার করলেন, যিনি একদিন রবীন্দ্রনাথের থেকে আলাদা হওয়াটাকে 'অন্যায় মনে' করতেন; বলেছেন, 'কৈশোরকালে আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন, যা থেকে বেরোবার ইচ্ছাটাকেও অন্যায় মনে হতো — যেন রাজদ্রোহের শামিল'। [বসু, ১৩৬১ : ১৪৪]। সেই কাজটা অর্থাৎ নজরুল, 'রবিতাপের চরম সময়ে রাবীন্দ্রিক বন্ধন ছিঁড়ে বেরোলেন, বলতে গেলে অসাধ্যসাধন করলেন। [...] তিনি দেখিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব।' [বসু, ১৩৬১ : ১৪৫-৬]। কেমন করে সম্ভব হলো এটা ? বুদ্ধদেব বলেছেন, 'এটাও খুব সহজেই ঘটেছিলো, এর পিছনে সাধনার কোনো ইতিহাস নেই, কতকগুলো আকস্মিক কারণেই সম্ভব হয়েছিলো এটা।' [বসু, ১৩৬১ : ১৪৫]। বুদ্ধদেব আরো এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কোনোরকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না-নিয়েও শুধু আপন স্বভাবের জোরেই রবীন্দ্রনাথকে পলাতে পারলেন তিনি, বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত আনতে পারলেন।' [বসু, ১৩৬১ : ১৪৬]। বুদ্ধদেব আরো মহা-আশ্চর্য কথা শোনালেন আমাদের। তিনি বললেন, 'তিনি [নজরুল] নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন' [বসু, ১৩৬১ : ১৪৬]। কিন্তু সে-যুগটার কথা নজরুল 'নিজে জানেন নি'! বুদ্ধদেব বসুর এসব কথা কারো অজানা নয়, কিন্তু এসব কথা এতই খামখেয়ালি, অসংলগ্ন এবং পরস্পরবিরোধী যে, তার জবাব দেবার আছে, সম্ভবত, এটা কারো মনে হয়নি! একটা প্রতিষ্ঠিত বিরাট ভাষা-গোষ্ঠীর ভিতর, পৃথিবীতে একটা মহান সাহিত্য-সমাজে, কেউ একটা নতুন যুগের সূচনা করছেন, এবং যিনি সম্পূর্ণভাবে মৌলিক কবি হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছেন, কিন্তু সেখানে তাঁর কোনোরকম সচেতন প্রস্তুতি ছিল না, কোনোরকম জাগ্রত-বুদ্ধি-শক্তির দরকার হয়নি, কোনোরকম সুস্থ-সবল চিন্তা-ভাবনা ও নতুন রুচিবোধ মনে দানা বাঁধেনি, কেবল 'কোলাহল' আর 'স্বভাব-কবিত্বের' জোরে এরকম একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল! এসব শুনে আমাদের মনে কেবলি বিস্ময় লাগে!

৪

দেখা যায়, বুদ্ধদেব বসু নজরুল-কাব্যের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, অন্ধকার জেনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। *কবিতা* পত্রের প্রবন্ধে লিখেছেন :

> নজরুল চড়া গলার কবি, তাঁর কাব্যে হৈ-চৈ অত্যন্ত বেশি — এই কারণেই তিনি লোকপ্রিয়। যেখানে তিনি ভালো লিখেছেন, সেখানে হৈ-চৈটাকেই কবিত্বমণ্ডিত করেছেন; তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনায় দেখা যায়, কিপলিঙের মতো তিনি কোলাহলকে গানে বেঁধেছেন। এ-ধরনের কবি হবার বিপদ এই

যে জোর আওয়াজ হ'তে থাকলেই মনটা খুশি হয়, সে-আওয়াজ যে অনেক সময় ফাঁকা আওয়াজ সে-খেয়াল একেবারেই থাকেনা। নজরুলের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি — অনেক লেখা তিনি লিখেছেন যাতে শুধু হৈ-চৈ আছে, কবিত্ব নেই। প্রেমের বা প্রকৃতির কবিতা লিখতে গিয়ে তাঁর এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে — একটি দুটি স্নিগ্ধ কোমল কবিতা ছাড়া প্রায় সবই ভাবালুতায় আবিল, অনর্গল অচেতন বাক্যবিন্যাসে ঘোলা। [বসু, ১৩৫১ : ২১]

বুদ্ধদেব বসুর *An Acre of Green Grass* (১৯৪৬) গ্রন্থটি যখন বেরোয় তাতেও দেখা যায়, তিনি লিখেছেন :

Nazrul, I repeat, is a loud poet, his poetry is boisterous. That kiplingesque clamour which made him widely read also subjected him to pitiful faults. He has written much that is heart-warming along with a lot of rast, himself unable to discern the difference. His effusivness, painful in descriptive nature, becomes intolerable in prose, with, in deed, he should never have written. [দাশগুপ্ত, ২০০০ : ১৩২]

তুলনামূলক আলোচনাসূত্রে বুদ্ধদেব বসু বললেন :

বায়রনের সঙ্গে নজরুলের সাদৃশ্য ধরা পড়ে—সেই কাঁচা, কড়া, উদ্দাম শক্তি, সেই চিন্তাহীন উচ্ছৃঙ্খলতা, আতিশয্য, শৈথিল্য, সেই রসের ক্ষীণতা, রূপের হীনতা, রুচির স্খলন। গ্যেয়টে বায়রন সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, নজরুল সম্বন্ধেও সে-কথা সত্য : The moment he thinks, he is a child. [বসু, ১৩৫১ : ২২]

একেবারে সুর সপ্তমে তুলে তিনি লিখেছেন :

পঁচিশ বছর ধরে প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি, কখনো বাড়েননি, বয়স্ক হননি, পর-পর তাঁর বইগুলিতে কোনো পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যায় না, কুড়ি বছরের লেখা আর চল্লিশ বছরের লেখা একই রকম। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিভা-প্রদীপে ধীশক্তির শুভ্র শিখা জ্বলেনি, যৌবনের তরলতা ঘন হতে পারেনি কখনো, জীবন-দর্শনের গভীরতা তাঁর কাব্যকে রূপলোক থেকে ভাবলোকে উত্তীর্ণ করেনি। [বসু, ১৩৫১ : ২২]

ইংরেজি প্রবন্ধেও সেই কথা :

For twenty-five years he has written like a boy of genious, without ever growing up or maturing. The sequence of his works does not give a history of development. [দাশগুপ্ত, ২০০০ : ১৩৩]

বুদ্ধদেব বসু 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে লিখেছেন :

নজরুলের কবিতা অসংযত, অসংবৃত, প্রগলভ; তাতে পরিণতির দিকে প্রবণতা নেই; আগাগোড়াই তিনি প্রতিভাবান বালকের মতো লিখে গেছেন, তাঁর নিজের মধ্যে কোনো বদল ঘটেনি কখনো, তাঁর কুড়ি বছর আর চল্লিশ বছরের লেখায় কোনো প্রভেদ বোঝা যায় না। [বসু, ১৩৬১ : ১৪৫]

উপর্যুপরি বুদ্ধদেবের এসব মতামত দেখে-শুনেই হয়তো রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 'কাজী নজরুল ইসলাম' নামে ১৪০৬ সনে *পরিচয়*-এর শারদীয় সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। নজরুলকে তিনি কেমন দেখেছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে তিনি তার উল্লেখ করেন। কলমে তিনি

তাঁর হৃদয়গ্রাহী বর্ণাঢ্য ছবি এঁকেছেন। তাতে তিনি অত্যন্ত অসংকোচে, মৃদুস্বরে, কিন্তু যথার্থ অর্থেই প্রতিবাদ করে লিখেছেন :

> বুদ্ধদেব বসু সুপণ্ডিত সাহিত্যরসিক মানুষ। তাঁহার কোনো অভিমত সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিতে আমার সংকোচ হয়। এতে এতটুকু বলিতে পারি যে নজরুলের কবিতা আমার কাছে সুরে-বাঁধা কোলাহল বলিয়া কখনও মনে হয় নাই। আবার ইহাও ভাবিয়াছি যে হৃদয়ে কোলাহল থাকিলে কবিতায়ও কোলাহলের সুর আসিয়া পড়িবে। কাব্যসংসারে বিচিত্র ভাব, বিচিত্র ভাষা। [দাশগুপ্ত, ২০০০ : ১৩২]

আরো লিখেছেন :

> নজরুলের সাহিত্যিক জীবনকাল মাত্র তেইশ বছরের, ১৯২০ হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত। তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যে এক উজ্জ্বল সরস ব্যক্তিত্বের পরিচয়। সেই ব্যক্তিত্বের বিচিত্র ভাব, বিচিত্র চিন্তার সমাবেশ। এবং এই ধারণা ও চিন্তার যেমন বিস্তার ও গভীরতা। [...] নজরুল কলম লইয়া কেবল হইচই করিয়াছেন এবং তিনি কখনও কোনো পরিণতি লাভ করেন নাই এই ধারণা লইয়া নজরুলকে চিনিতে পারিব না। [দাশগুপ্ত, ২০০০ : ১৩৪]

নজরুলের কাব্য-বিচারে বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের কাছে অন্যায় মনে হয়েছে। কেননা নজরুলের সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে যে-বক্তব্য তাতে শিল্পের বিচারে, কলা-কৌশলগতভাবে এবং ইতিহাসের পারম্পর্যের রীতি অনুসারে একটা অপূর্বত্ব তো আছেই — সর্বোপরি দামি জিনিশ যা আছে, তা হচ্ছে নজরুল 'দেশমাতার সেবক'। দেশকর্মী ও সমাজকর্মীর সঙ্গে সাহিত্যকর্মীর একটা অপূর্ব মিলন ঘটেছে দেখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে বরমাল্য দান করেছিলেন। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত সে-কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি। নজরুলের মধ্যে এই সমন্বয় যে যথার্থই অপূর্ব, নজরুল আলোচনায় অনেকেই ব্যাপারটা লক্ষ করেন না। নজরুল-বিচারে যত বিপর্যয় সেইখানে।

অন্য একটি কথাও এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। তাঁর পুরো জীবন পাঠ করলে দেখা যায়, স্বভাবের গভীরতম অংশে নজরুল ছিলেন নিঃসঙ্গ, একাকী। সেটা তিনি কাটাতে চাইতেন অথবা অতিক্রম করতে চাইতেনও, অনেক সময় হৃদয়ের কোলাহল বাইরে প্রকাশ করে। সত্য যে, তিনি যে-জীবন আকৈশোর বহন করেছেন, তা ছিল আত্মীয়-স্বজন বিচ্ছিন্ন — সে-ও কী কম দুঃসহ এবং দুঃখের? মমতা জিনিশটা পাওয়া এবং দেওয়ার ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে একটা আদিমতা কাজ করে। সে যেমন দিতে চায়, তেমনি পেতেও চায়। নজরুল সাংসারিক হিসাবে সমস্ত কিছু হারিয়ে তাঁর চারপাশের মানুষের কাছে ঐ মমতাটুকু পেতে চাইতেন। তাঁর চারিত্র্যনীতি এবং সৃষ্ট সাহিত্য একটু যত্ন নিয়ে পাঠ করলে এরকমই মনে হয়। কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছে, বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গিগত একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। সেটা আমরা বুঝে নিতে চাইব, কিন্তু শিল্পের ব্যাপারে নজরুলের আসলে কোনো চিন্তা ছিল কিনা, সেটা তাঁর নিজের কাছ থেকেই শুনে নেওয়া দরকার।

৫

মানুষের বিপুল দুঃখ যদি কাব্যে বাঁধা যায়, আর সে কাব্য যদি মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে, অপরদিকে কাব্যের রসজ্ঞও যদি তার অনুমোদন করেন, তা হলেই কবির যে সাধনা,

তা সার্থক রূপ পায়। নজরুল মনে করেন, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের জীবনে যে-সময়ে বিপুল যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার আরম্ভ, সে-সময় থেকেই কাব্যের সৃষ্টি। কাব্য একদিকে সেই লাঞ্ছনার ইতিহাস, অপরদিকে তা মুক্তির আনন্দ-শিল্প। *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *ইলিয়াড* প্রভৃতি মানুষের সেই মহাবেদনা ও মহা-আনন্দের মহাকাব্য। এতে যদি কিছু শিল্পের ঘাটতি পড়ে থাকে, তা নিয়ে অনুশোচনা বৃথা। এমন কথা নজরুল মনে করলেও কাব্যের উৎকর্ষ ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন। একটা উদাহরণ দিই। তিনি কবি আবদুল কাদিরকে এক চিঠিতে লিখেছেন :

> তুমি আজকের মানুষকে খুশি করতে গিয়ে কালকের অনাগতদের অসম্মান অর্জন করো না যেন। ঐ রোগ আমার যে সর্বনাশ করেছে, তার ক্ষতিপূরণ বুঝি সারা জীবনেও হবে না। বহুদিন আনন্দলোকের দ্বারে বসে কনসার্টই বাজিয়েছি হাতের বাঁশি ফেলে। তাতে বুকের ব্যথা বেড়েছে বৈ কমেনি। আজ সে ব্যথার কথাই যখন সুরের সুতোয় গাঁথলাম, তখন ব্যথাও যেমন কমেছে, ক্ষতটাও তেমনি মালায় ঢাকা পড়েছে। আমার চোখের জলে সকলের জল এসে মিশেছে। আমার বেদনালোক তীর্থলোকে পরিণত হয়েছে। সরব হাততালির লোভের চেয়ে নীরব চোখের জলের অর্ঘ্য তোমার কাম্য হোক — এরচেয়ে বড় প্রার্থনা আমার নেই। [নজরুল, ২০০৯ : ২৪৭]

এরপরও যদি কেউ নজরুলের শিল্পজ্ঞানের প্রশ্ন তোলেন, তাহলে তর্কে যোগ দেওয়া কেবল অসার্থক নয়, পণ্ডশ্রম। কেননা এ-জগতে মানুষে যা আত্মসাৎ করতে পারে না, তাকেই সে ভস্মসাৎ করতে চায়। কাজেই ঠিক জায়গায় আলো ফেলা দরকার।

৬

নজরুলের গদ্য সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন : 'গদ্যলেখক হ'য়ে তিনি জন্মাননি, কিন্তু গদ্যও তিনি লিখেছেন, এবং গদ্যে যে তাঁর অতিমুখর মনের অসংযত বিশৃঙ্খলা সবচেয়ে দুঃসহ হ'য়ে প্রকাশ পাবে সে তো অনিবার্য।' [বসু, ১৩৫১ : ২১]। নজরুলের গদ্য সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর একথাটিরও প্রতিবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত : 'নজরুলের গদ্য দুর্বল, ইহা গদ্যই নহে। এ কথা অবশ্যই মানি না।' [দাশগুপ্ত, ২০০০ : ১৩৩]। রবীন্দ্রকুমার তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে নজরুলের 'নবযুগ' প্রবন্ধ থেকে যে অংশটি তুলে দেন তা এই :

> দাঁড়াও জন্মভূমি জননী আমার! একবার দাঁড়াও!! যেদিন তুমি সমস্ত বাধা-বন্ধন-মুক্ত, মহা-মহিমময়ী বেশে স্বাধীন বিশ্বের পানে অসঙ্কোচ দৃষ্টি তুলিয়া তাকাইবে, সেদিন যেন নিজের এই ক্ষত-বিক্ষত অঙ্গ, ঝাঁজড়াপড়া বক্ষ, শোণিতলিপ্ত ক্রোড় দেখিয়া কাঁদিয়ো না। তোমার পুত্র শোকাতুর বুকের নিবিড় বেদনা সেদিন যেন উছলিয়া উঠে না, মা! সেদিন তুমি তোমার মুক্ত শিশুদের হাত ধরিয়া বিশ্বমঞ্চে বীরপ্রসূ জননীর মত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়ো। ঐ দূর সাগরপার হইতে তোমার মুখে সেদিন যেন নব প্রভাতের তরুণ হাসি দেখি। [দাশগুপ্ত, ২০০০ : ১৩৩]

অরবিন্দ পোদ্দার 'কবি নজরুল' নামের একটি প্রবন্ধে নজরুল-গদ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[২] তাঁর সে-প্রশংসার সপক্ষে নজরুলের 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধ থেকে যে অংশ উদ্ধৃত করেন তা এরকম :

> সহসা যেন কোন করাল ভয়ঙ্কর-শক্তি আমায় নীচের দিকে টানতে লাগল। বলতে লাগল, 'তোমার মাতৃ-ঋণ — তোমার স্বদেশের ঋণ শোধ না হতে কোথায় যাবে উন্মাদ?' আমি বললাম, 'সাবধান! আমার মাঝে প্রলয়-সুন্দর আছেন!' সেই ভয়ঙ্কর বিরুদ্ধ শক্তি প্রবলবেগে নিম্নপানে টানতে লাগল। বললে, 'সেই প্রলয়-সুন্দর তোমার মত অজ্ঞানোন্মাদ নন, তোমার সেই পৃথিবীর ঋণ, ভারতের ঋণ, বাঙলার ঋণ, মানব-রূপী তোমার আত্মার আত্মীয়ের ঋণ সম্পূর্ণরূপে শোধ না-করে তুমি যেতে পারবে না। [পোদ্দার, ১৩৬৪ : ৪৭]

আমরা নজরুলের একটি চিঠি থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করে দিই :

> অদ্ভুত রহস্যে ভরা এই মানুষের মন। রক্তের সম্বন্ধকে অস্বীকার করতে দ্বিধা নেই যার, সে-ই কখন পথের সম্বন্ধকে সকল হৃদয় দিয়ে অসঙ্কোচে স্বীকার করে নেয়। ঘরের সম্বন্ধটা রক্ত-মাংসের, দেহের, কিন্তু পথের সম্বন্ধটা হৃদয়ের অন্তরতমজনার। তাই ঘরের যারা, তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি, মেনে চলি, কিন্তু বাইরের আমার-জনকে ভালবাসি, তাকে না-মানার দুঃখ দিই। ঘরের টান কর্তব্যের, বাইরের টান প্রীতির — মাধুর্যের। সকল মানুষের মনে কালের এই বাঁধন-হারা মানুষটি ঘরের আঙিনা পেরিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছে। যে নীড়ে জন্মেছে এই পলাতক, সেই নীড়কেই সে অস্বীকার করেছে সর্বপ্রথম উড়তে শিখেই। আকাশ আলো কানন ফুল, এমনি সব না-চেনা জনেরা হয়ে ওঠে তার অন্তরতম। [নজরুল, ২০০৯ : ২৪৭]

নজরুলের গদ্য সেই শ্রেণির, বাংলা শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ সাহিত্য যে-ভাষায় রচিত হয়েছে। গদ্য ভাষার সৌন্দর্য, তার ভাবের ঐশ্বর্যে, সুশৃঙ্খল চিন্তার প্রকাশে। যে-গদ্যে দেখা যায় এই দুয়ের অভাব, সে-গদ্য অন্যসব গুণের অধিকারী হলেও তার দাম খুব বেশি নয়। নজরুলের গদ্য এ-দুই সম্পদ থেকে বঞ্চিত নয়। তবে প্রথমত, তাঁর গদ্য বীর রসের; দ্বিতীয়ত, শক্তিশালী ভাবপ্রবাহের সঙ্গে প্রাণবন্ত ভাষায় তা রচিত। মোটকথা, নজরুলের গদ্যের স্পষ্ট ও শ্রেষ্ঠ গুণ তার গতি ও প্রাণ। তাঁর গদ্য থেকে উদ্ধৃত অংশগুলো এ-কথা প্রমাণ করে। নজরুলের গদ্য তাঁর 'অসংযত বিশৃঙ্খল' মনের প্রকাশ, বুদ্ধদেব বসুর এ-কথায় তাঁর সংযত শিল্পী-মনের বিচারনিষ্ঠার অভাব আছে। তাঁর এই নিষ্ঠা নজরুলের সঙ্গীত সম্বন্ধেও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেটা বুদ্ধদেব বসুর মুখে শোনা উচিত।

৭

নজরুলের গান সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে :

> কথার চেয়ে বেশি তাঁর হাসি, হাসির চেয়েও বেশি তাঁর গান। একটি হারমোনিয়াম এবং যথেষ্ট পরিমাণে চা-পান দিয়ে বসিয়ে দিলে একসঙ্গে পাঁচ-সাত ঘণ্টা গান-গাওয়া তাঁর পক্ষে কিছুই নয়। গানে তাঁর আন্না নেই; ঘুমের সময় ছাড়া সবটুকু সময় গাইতে হ'লেও তিনি প্রস্তুত। কণ্ঠস্বর মধুর নয় তাঁর, ভাঙা ভাঙা খাদের গলা, কিন্তু তাঁর গান-গাওয়ায় এমন একটি আনন্দিত উৎসাহ, সমস্ত দেহ-মন-প্রাণের এমন একটি প্রেমের উচ্ছ্বাস যে আমরা মুগ্ধ হ'য়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছি। সে সময়ে গান রচনা করতেও দেখেছি তাঁকে — হারমোনিয়াম, কাগজ আর কলম নিয়ে বসেছেন, বাজাতে-বাজাতে গেয়েছেন, গাইতে-গাইতে লিখেছেন। সুরের নেশায় এসেছে কথা, কথার ঠেলা সুরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেবারে ঢাকায় যে-সব গান তিনি লিখেছিলেন সেগুলি প্রায় সবই স্বরলিপি-সমেত 'প্রগতি'তে বেরিয়েছিলো। [বসু, ২০০৯ : ৭১]

এরপর মন্তব্য :

> তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তাঁর গানের। বীর্যব্যঞ্জক গানে — চলতি ভাষায় যাকে স্বদেশি গান বলে — রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পরেই তাঁর স্থান, 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' উৎকর্ষের শিখরস্পর্শী। সাধারণভাবে বলা যায় যে তাঁর গান তাঁর কবিতার চেয়ে বেশি তৃপ্তিকর — গানের ক্ষুদ্র আকারে তাঁর অতিকথন প্রশ্রয় পেতে পারেনি — 'বুলবুল', 'চোখের চাতক' কিছু-কিছু রচনা পাওয়া যাবে, যাকে অনিন্দ্য বললে বেশি বলা হয় না। [বসু, ১৩৫১ : ২২]

চতুরঙ্গ পত্রিকায় [একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৬] 'বাংলার গান' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বলেন :

> নজরুলের প্রাধান্য প্রথম থেকেই স্পষ্ট, এখন স্বতঃসিদ্ধ। একে তো কবিত্বে কোনো তুলনা হয় না, তার উপর সঙ্গীতেও নজরুলের ক্ষমতা বড়ো, প্রাচুর্য বেশি, বিচিত্র বহুমুখিতা— রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে — অনন্য। অতুলপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য, শেষ পর্যন্ত এইখানে যে চিরাচরিত ভারতীয় ভক্তিরসে নিজস্ব একটি নিবিড়তা তিনি এনেছিলেন; কিন্তু নজরুলের মৌল উপকরণই অংশত অপূর্ব ব'লে বাংলা গানের সামগ্রিক গতিরই তিনি মোড় ফেরালেন। এটা লক্ষণীয় যে রচনার প্রবলতা এবং পরিমাণ, আর সেই সঙ্গে বিরল ব্যক্তিগত মনোহারিতা সত্ত্বেও, সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে নজরুলের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী বা নামমাত্র; কিন্তু সঙ্গীতে তিনি প্রবর্তক, প্রজনক। [মিত্র, ১৯৯৯ : ৭৫]

নজরুল-সঙ্গীতের কথা বা বাণী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য :

> কত গান সুন্দর আরম্ভ হয়েছে, সুন্দর চলে এসেছে, কিন্তু শেষ স্তবকে কোনো-একটা অমার্জিত শব্দ প্রয়োগে সমস্ত জিনিশটিই গেছে নষ্ট হয়ে। তাঁর প্রেমের গান সরস, কমনীয়, চিত্রবহুল; কিন্তু তার রস আমাদের মনের মধ্যে ঘনীভূত হ'তে হ'তে হঠাৎ কোনো স্থূল স্পর্শ এসে প্রায়ই বিমুখ ক'রে দেয়। গীতরচয়িতার অন্য সমস্ত গুণ তাঁর ছিলো — শুধু যদি এই দোষ না থাকতো, শুধু যদি তাঁর রুচি নিখুঁত হ'তো তাহ'লে তাঁর মধ্যে একজন মহৎ গীতিকারকে আমরা বরণ করতে পারতাম। একটি দোষে অনেক গুণ ব্যর্থ হ'লো। [বসু, ১৩৫১ : ২২]

বুদ্ধদেব বসুর মতে নজরুলের যে রুচির দোষ সেটা 'অনতিক্রম্য' নয়, 'দুরতিক্রম্য'। এসব কারণে বুদ্ধদেব বসু প্রস্তাব করেছিলেন :

> 'নজরুলের সমস্ত গানের মধ্যে যেগুলি ভালো সেগুলি সযত্নে বাছাই ক'রে নিয়ে একটি বই বের করলে সেটাই হবে নজরুল-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় — সেখানে আমরা যাঁর দেখা পাব তিনি সত্যিকার কবি, তাঁর মন সংবেদনশীল, সূক্ষ্ম-কোমল, আবেগপ্রবণ, উদ্দীপনাপূর্ণ। সে-কবি শুধু বীররসের নন, আদিরসের পথে তাঁর স্বচ্ছন্দ আনাগোনা, এমনকি হাস্যরসের ক্ষেত্রেও প্রবেশ নিষিদ্ধ নয় তাঁর। 'বিদ্রোহী' কবি, 'সাম্যবাদী' কবি কিংবা 'সর্বহারা'র কবি হিশেবে মহাকাল তাঁকে মনে রাখবে কিনা জানিনে, কিন্তু কালের কণ্ঠে গানের মালা তিনি পরিয়ে দিয়েছেন, সে-মালা ছোটো কিন্তু অক্ষয়।' [বসু, ১৩৫১ : ২৩]

নজরুল-সঙ্গীত বিষয়ে এ-পর্যন্ত বুদ্ধদেব বসুর যে-সমস্ত মতামত জানা গেল, তাতে তাঁর স্ববিরোধিতার 'দোষ' লক্ষণীয়। এমনকি তাঁর বাক্‌চাতুর্যও বিশেষভাবে উপেক্ষা করবার মতো নয়। তিনি ইংরেজিতে যে-প্রবন্ধটি — 'Modern Bengali Music and Nazrul

Islam' লেখেন, তাতেও নজরুল সম্পর্কে তাঁর ভুল ধারণারই প্রমাণ মেলে। যাঁরা সঙ্গীত বিষয়ে বিজ্ঞ তাঁরা এসব নিয়ে আলোচনা করছেন এবং করবেন। আমরা এবার দুই কবির দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যটা বুঝে নিতে চাইব।

৮

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কবি এবং কবিতা ছিল বুদ্ধদেব বসুর ধ্যানের বিষয়। এ-বিষয়ে তাঁর ক্লান্তিহীন অধ্যবসায়, প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডার তুলনা, তাঁর সময়ে মেলে না। তিনি তাঁর অসামান্য প্রতিভা সারাজীবন এই কাজে ব্যয় করেছেন। ব্যয় করার শক্তি তাঁর ছিল। তাঁর সময়ের কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য হওয়ার মতো শিক্ষাগত প্রস্তুতি, সুযোগ এবং জনপ্রিয়তা সবই তাঁর অনুকূলে ছিল। তাঁর মানস-বৈশিষ্ট্য, তাঁর বাচনভঙ্গি, তাঁর প্রাচীন সাহিত্যরীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সবদিক থেকেই তাঁর কালের কলকাতা, এমনকি ঢাকাতেও তাঁর নামকে কেন্দ্র করে বিস্তর শোনা গিয়েছিল। সে-সময়ে বুদ্ধদেব বসু এবং আধুনিকতাবাদ ছিল এক, অভিন্ন। তাঁর রচনাবলি ও তাঁর কর্মজীবনের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনি দেখতে পাবেন, বুদ্ধদেব তাঁর আধুনিকতাবাদের পক্ষে কাজ করতে আলস্যহীন, নিদ্রাহীন, তন্দ্রাহীন কর্মী। বাংলা সাহিত্যে কাউকে যদি বিশুদ্ধ শিল্পকর্মী বলা যায়, তবে তিনি বুদ্ধদেব বসু। তিনি সেখানে এক ও অদ্বিতীয় কর্মী এবং স্রষ্টা। এই কাজে তিনি যে কেবল তাঁর কাব্য-মতবাদ আর তাঁর সহযাত্রীদের নিয়েই সক্রিয়-ব্যস্ত ছিলেন, তা নয় — পূর্বসূরি কবি ও তাঁদের সৃষ্ট কবিতার মূল্যায়নেও সমানভাবে তিনি কলম চালিয়েছেন। তাঁকে এ-কাজ করতে হয়েছিল তার কারণ, তাঁরা যে তাঁদের থেকে আলাদা — কেবল আলাদা নয়, একেবারে স্বতন্ত্রভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং উজ্জ্বল — এটা প্রমাণ করা তাঁদের কাছে আবশ্যিক নয়, জরুরি হয়ে পড়েছিল। এই অপূর্ব স্বাতন্ত্রিক চেতনায় তাঁরা রবীন্দ্রনাথকেও আধুনিক কবির মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। ধারণা করা যেতে পারে, আধুনিকতাবাদে না-জড়িয়ে, একমাত্র রাজনীতির উন্মত্ততার দোহাই পেড়েই নজরুলকে খারিজ করার সহজপদ্ধতি তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। সেজন্য দেখা যায়, নজরুলের কোনো সৃষ্টিই যথার্থ অর্থে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। সত্য বটে, নজরুল-মামলায় তাঁরা সফল হয়েছিলেন। কিন্তু সেই পুরাতন কথা — কাল নিরবধি, পৃথিবী বিপুলা। নজরুল ভবভূতির এই কথা আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে আমার স্থান সম্বন্ধে আমি কোনদিন চিন্তা করিনি। এর-জন্য লোভ নেই আমার। সময়ই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সমালোচক'। [নজরুল, ২০০৯ : ১৯৩]। নজরুল প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক-কর্মী ছিলেন না, যদি-বা একবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন রাজনীতিসচেতন কবি — বলা চলে, এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন রাজনীতির রক্ত-দিয়ে গড়া মানুষ। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সেক্যুলারিজম, অসাম্প্রদায়িক-চেতনা, রেনেসাঁস প্রভৃতি মূল্যবোধে তিনি কেবল বিশ্বাসী ছিলেন না, এসব ধারণার সঙ্গে তাঁর রক্ত ছিল মিশে। তাঁর সমস্ত রচনা তাঁর এই আদর্শ-চেতনার মূল্য বহন করছে। তিনি মানুষের চেয়ে অপর কোনো-কিছুকে বড় করে ভাবতে পারেননি। বুদ্ধদেব বসু আজীবন সম্পূর্ণরূপে ছিলেন রাজনীতিবিরোধী। উপরে বর্ণিত কোনো-একটা আদর্শ-চেতনা বুদ্ধদেব বসুর রচনাবলিতে পাওয়া কঠিন। জীবনের,

সমাজের, রাষ্ট্রের কোনো মৌল-প্রত্যয়ের প্রশ্নে তিনি ক্ষরিত হননি। স্বাভাবিকভাবে, নজরুল-আলোচনায়, বুদ্ধদেবের ঐ রাজনীতিবিরোধী মনোভাবটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর 'বিশুদ্ধ', 'শান্তচিত্ত' শিল্পী-মনও নজরুল-বিবেচনায় রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে, তিনি নজরুলের কাব্য-বিচারে শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ ঔদার্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। এ-জন্য দেখা যায়, নজরুল সম্পর্কে তাঁর কতকগুলো ভালো কথার সঙ্গে ভুল কথা, অন্যায় কথা, অর্ধসত্য কথা, অবিবেচনা এবং ত্রুটিপূর্ণ মন্তব্য নির্বিশেষে একাকার হয়ে গেছে। কেন এমনটা হলো — এই জিজ্ঞাসা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মীমাংসা সহজ নয়। তবু কিছু কথা যথাসম্ভব পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে বুঝে নেওয়া যেতে পারে।

৯

নজরুল ছিলেন প্রগতিতে বিশ্বাসী। অর্থাৎ তাঁর সামনে যে পরাধীন ভারতবর্ষ ছিল, আর সে ভারতবর্ষের মানুষ যে শতকোটি পদদলন ও লাঞ্ছনার মধ্যে পতিত হয়ে আছে, যারা সীমাহীন নানা পীড়নে শতচ্ছিন্ন — মনে ও প্রাণে যারা আশাহত — যে-সব অগণিত অন্যায়কে তারা মুখ বুজে সহ্য করে চলেছে, সে-সবকে অতিক্রম করে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির মূল্যেও একদিন এই মানুষই উন্নত হয়ে, শিরদাঁড়া-খাড়া করে বৃহত্তর কল্যাণে ও ন্যায়ের অভিমুখে উত্তীর্ণ হতে পারবে — এই অমোঘ বিশ্বাস থেকে নজরুলের বিচ্যুতি ঘটেনি কোনোদিন।

এখানে নজরুলের *সর্বহারা* বইটির কথা স্মরণ করা যাক — যেখানে তিনি পাঠকদের একটা অপূর্ব ভাব উপহার দিয়েছেন। সেটা পড়লে পাঠক-মনে কী-রকম ভাবের উদয় হয় — নজরুল আমাদের বোঝাচ্ছেন, মানুষ যত পতিত হোক, যত ছোট হোক, যত ক্ষুদ্র হোক, যত পাপাচারী হোক — তার সম্মুখেও প্রসারিত সীমাহীন জগৎ, অনন্ত বিশ্ব। সেই বিশ্বের যে-কোনো উত্তুঙ্গ চূড়ায় আরোহণ করার অধিকার তাঁর আছে। এই আত্মবোধে ও আত্মবিশ্বাসে মন প্রশস্ত হয় — আকাশের অবারিত মহিমার সঙ্গে মানুষ মিলিত হয়ে কবির সঙ্গে একাত্মবোধে মহিমান্বিত হয়।

পৃথিবীতে এমন কবি নেই যাঁর অধিকাংশ কাব্য — তাঁর সময়ের সরকার-কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছে! কবিতা লেখার দোষে, ব্রিটিশ-শক্তির কারাগারে জেল-খেটে, শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েও নজরুলের দুঃখের অবসান হয়নি। তাঁর স্বজাতিও তাঁকে কম কষ্ট দেয়নি। তিনি এক চিঠিতে উল্লেখ করেছেন : 'মানুষ কি আমায় কম যন্ত্রণা দিয়েছে? পিঁজরায় পুরে খুঁচিয়ে মেরেছে ওরা। তবু এই মানুষ — এই পশুর জন্যই আমি গান গাই। তারই জন্য আছি আজো বেঁচে।' [নজরুল, ২০০৯ : ২২০] মানুষ হিসেবে মাথা উঁচু করে, শত যন্ত্রণা সয়েও নজরুলের এই যে উত্তুঙ্গ আশাবাদ — এমন আশাবাদে বুদ্ধদেবের আস্থা ছিল না। তাঁর ভাবনা ভিন্ন রকম ছিল।

বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে, মানুষের আয়ু বাড়ছে, তার অধিকার অন্তত মৌখিকভাবে হলেও স্বীকৃতি লাভের পথে; মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার যেখানে ক্রীতদাসের, বৈষম্য যেখানে সীমাহীন, পীড়ন যেখানে মানব-কল্পনার অতীত, আধুনিককালে সে-সব ধিক্কৃত হচ্ছে। এসব ব্যাপার বুদ্ধদেব বসুর অজানা ছিল না। কিন্তু মানুষের মনে শান্তি কোথায়?

এখানে আধুনিকতাবাদী বুদ্ধদেব নৈরাশ্য ও হতাশাকেই প্রাধান্য দিলেন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে। বুদ্ধদেবের মন জিজ্ঞাসাকাতর, হৃদয়ে দহন অনির্ণেয়। মানুষ শান্তির কথা বলে, শান্তি কি সম্ভব? এমন কি আদৌ কাম্য? এ-কথা আজ সকলেরই জানা যে, রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতা তাঁকে টানত না। নজরুল কিংবা রবীন্দ্রনাথের মানুষের প্রতি যে অবিচলিত বিশ্বাস, সেটাকে তিনি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারতেন না। কেন তাঁর আপত্তি? এই আপত্তির ভিত্তি কী?

অম্লান দত্তের মতে, প্রকৃতি এবং মানুষের সভ্যতার অন্য একটি পরিচয় বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছে।[৩] তিনি দেখছেন, বিজ্ঞান মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিবেচনাহীনতায়ও তার জুড়ি নেই। অপরদিকে প্রকৃতি সুন্দর হলেও তার একটা কুৎসিত রূপ আছে — সেটা মানুষের অগোচর নয়। যদি-বা মহাত্মা গান্ধীর কাছে এই প্রকৃতির রূপ মানবসৃষ্ট শিল্পের চেয়ে মূল্যবান মনে হয়েছে। এমনকি মানবসৃষ্ট শিল্পের তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নি, যদি রাত্রির তারকাখচিত অনাবিল আকাশ ও ভজন তাঁর সামনে থাকে। কিন্তু বুদ্ধদেবের কাছে মনে হয়েছে, সেই প্রকৃতি রমণীয় হলেও পচনশীল — অতএব এ-সবই বিশ্বাসঘাতক; তিক্ত, কদর্য, অবাঞ্ছিত। শিল্পে রূপান্তরিত হলে পরে, তবেই এসব মধুর ও সুন্দর।

১০

বুদ্ধদেব *কবিতার শত্রু* ও *মিত্র* নামে যে বইটি লিখেছিলেন — সেটা আকারে ক্ষুদ্র হলেও, তাতে তাঁর মনোভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি সেখানে শিল্পকলার সঙ্গে মানব-সভ্যতার বিরোধ এবং পার্থক্য কোথায়, সেটা দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর ভাষাতেই সে-ক্ষুদ্র গ্রন্থটির মূল বক্তব্যটা জানা যেতে পারে। তিনি বলেছেন :

> সভ্যতার একটি লক্ষ্য হ'লো সামঞ্জস্য-স্থাপন — মানুষের সৃষ্ট ধর্ম বিজ্ঞান সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি অনবরত এই চেষ্টাতেই ব্যাপৃত — প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের, ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর, ও ভিন্ন-ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সামঞ্জস্য, মানুষের দৈহিক ও আত্মিক জীবনের মধ্যে, তার অন্তঃস্থিত দেবতা ও দানবের মধ্যে: — আপ্রাণ চেষ্টা, কিন্তু সফল হয়নি কখনো, পৃথিবীর কোনো ক্ষুদ্র অংশে ক্ষণিকের জন্য সফল হয়ে থাকলেও স্থায়িত্ব বা সার্বিকতার সম্ভাবনাও কখনো দেখা দেয়নি। কোনো জাতি অথবা গোষ্ঠীর কথা ছেড়েই দাও — ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্যবোধ, তা-ই বা কত বিরল! কত বিরল সেই মুহূর্তগুলি, যখন বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর, পিতার সঙ্গে পুত্রের, এমনকি প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার মৈত্রীবন্ধনে কোথাও কোনো অপূর্ণতা থাকে না। মনে হয় মানবজীবনের বড়ো অংশটা বিসংগতি নিয়েই কেটে যায় — হয়তো তার চৈতন্যবিকাশের এটাও এক ফলাফল; তা যত অব্যক্ত থাকে ততক্ষণ সংসার যাত্রা ব্যাহত হয় না, প্রকট হ'লেই ছড়িয়ে পড়ে অশান্তি। [বসু, ১৯৭৪ : ৪৫]

জাগতিক সমস্ত 'অশান্তি' থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য বুদ্ধদেব আশ্রয় নিলেন শিল্পকলায়। কেননা তাঁর মতে, মানবজীবনের জন্য শিল্পকলাই একমাত্র 'সুসমঞ্জস'। তাঁর কথাটাই তুলে দিই :

> মানুষের অন্য একটি সৃষ্টি আছে — একটি মাত্র — যা বহুবাঞ্ছিত ও অতি দুর্লভ সামঞ্জস্যের প্রতিমূর্তি : সেটা তর্কাতীতভাবে শিল্পকলা। শিল্পকলা শুভ না অশুভ, সত্য না মিথ্যা, অনুকরণ না নতুন সৃষ্টি — এ-নিয়ে অনন্তকাল তর্ক চলতে পারে — কিন্তু একথা সকলকেই মানতে হবে যে : শিল্পকলা অবিকলভাবে সুসমঞ্জস। [বসু, ১৯৭৪ : ৪৬]

বুদ্ধদেব এই শিল্পের পক্ষে লড়াই করেছেন আজীবন। কেননা তাঁর মতে, এতেই মানুষের বেঁচে থাকার সার্থকতা। বলা বাহুল্য, নজরুল জীবনের তাৎপর্য এ-পথে খোঁজেন নি। এ-পথ ভালো কি মন্দ, সে-কথা আলাদা। আমরা দুই কবির দৃষ্টিভঙ্গিটাই বুঝে নিতে চাইছি এখানে। বুদ্ধদেব বসুর নৈরাশ্যটাও হয়তো অ-কারণে নয়। কালের ধর্ম স্বীকার্য। আবার নজরুলের প্রগতিপন্থার মূল্যও বুঝে নেবার প্রয়োজন আছে। সেই যে নজরুল বলেছেন :

> আমি আজও মানুষের প্রতি আস্থা হারাইনি — তাদের হাতের আঘাত যত বড় এবং যত বেশিই পাই। মানুষের মুখ উল্টে গেলে ভূত হয়, বা ভূত হলে তার মুখ উল্টে যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয় উল্টে গেলে সে যে ভূতের চেয়েও কত ভীষণ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র হয়ে ওঠে — তা-ও আমি ভাল করেই জানি। তবু এই মানুষকে শ্রদ্ধা করি — ভালবাসি। স্রষ্টাকে আমি দেখিনি কিন্তু মানুষকে দেখেছি। এই ধূলিমাখা পাপলিপ্ত অসহায় দুঃখী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করবে, চির-রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবে, এই ধুলোর নীচে স্বর্গ টেনে আনবে, এ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। সকল ব্যথিতের ব্যথায়, সকল অসহায়ের অশ্রুজলে আমি আমাকে অনুভব করি, এ আমি একটুও বাড়িয়ে বলছিনে, এই ব্যথিতের অশ্রুজলের মুকুরে যেন আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিছু করতে যদি নাই পারি, ওদের সাথে প্রাণভরে যেন কাঁদতে পাই! [নজরুল, ২০০৯ : ১৮০]

নজরুলের কাব্য-চেতনায় যে মানবনিষ্ঠা, সমকালনিষ্ঠা, সমাজনিষ্ঠা, রাজনীতিনিষ্ঠা, সত্যনিষ্ঠা এবং এসব নিষ্ঠায় জীবনের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত তাঁর যে অতন্দ্র ভূমিকা, সে-ভূমিকা না বুঝে তাঁর শিল্পকে বুঝতে চাওয়া অর্থহীন। নজরুলকে বুঝতে চাইলে তাঁর পথেই বুঝতে হবে। বুদ্ধদেব এই বিবেচনায় ছিলেন অনাগ্রহী। তাঁর এই অনাগ্রহ এসেছে তাঁর শিল্পবোধের সম্মোহন থেকে। এ সম্মোহন থেকে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন *কবিতার শত্রু ও মিত্র*। জীবনের শেষ পর্বে এসে বুদ্ধদেব এক চিঠিতে লিখেছেন, 'যে-কোনো সৎকর্মে, নিরপরাধ কর্মে নিষ্ঠা দেখলে, তা নিয়ে কাউকে কঠিন শ্রম করতে দেখলে আমার মনে হয় মনুষ্যজাতির বাঁচার আশা সেখানেই। যে-কোনো সৃষ্টিশীল শ্রমের মতো (হোক তা কৃষি বা মেয়েদের গৃহকর্ম বা গবেষণা বা কবিতা লেখা) সুন্দর, উজ্জীবক ও স্বাস্থ্যকর আর কিছু নেই।' এইখানে নজরুলের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর বিরোধ নেই। যে-মানুষের পক্ষে, নজরুল পুরো জীবন 'কঠিন শ্রম করতে' ছিলেন নিদ্রাহীন, সেই মানুষের আনন্দ-শিল্প-গড়ায় বুদ্ধদেব ছিলেন আমৃত্যু জাগ্রত। নজরুল 'সৎকর্মে নিরপরাধ কর্মে নিষ্ঠ ছিলেন, বুদ্ধদেবও তাই। এঁদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এটুকু যে, কেউ জীবনের পাঠ নিয়েছিলেন জীবন থেকে, কেউ রস-সাহিত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে।

টীকা

১. বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত *কবিতা* 'নজরুল সংখ্যা' হিসেবে প্রকাশিত হয় দশম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১। খ্রিষ্টাব্দের হিসেবে সালটা ১৯৪৪। এ সংখ্যায় নজরুল সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু ছাড়া জীবনানন্দ দাশ, লীলাময় রায়, নলিনীকান্ত সরকার, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও আনওয়ারুল ইসলাম লিখেছিলেন। 'নজরুলের প্রতিকৃতি, হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি, অপ্রকাশিত কবিতা ও গান এবং গ্রন্থপঞ্জী' সমেত ৪৪ পৃষ্ঠা ছিল সংখ্যাটি। চশমা ও টুপি পরা নজরুলের প্রতিকৃতিটি ছিল ১৯৪০ সনে কবির হরি ঘোষ স্ট্রিটের বাড়িতে পরিমল গোস্বামীর তোলা।

২. অরবিন্দ পোদ্দার নজরুলের গদ্যের প্রশংসা করলেও তাঁর নজরুলের কাব্য-বিচার বুদ্ধদেব বসুর অনুরূপ। সেদিক থেকে অরবিন্দ পোদ্দারের লেখাটি বিশেষত্বহীন। প্রবন্ধটির জন্যে দ্রষ্টব্য : 'কবি নজরুল', *ক্রান্তিকাল*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬৪।

৩. অম্লান দত্তের মতামতের জন্যে দ্রষ্টব্য : 'বুদ্ধদেব বসু', *সমতট : ১৬৩-১৬৪*, 'অম্লান দত্ত স্মরণ সংখ্যা', জানুয়ারি-জুন ২০১০।

গ্রন্থ ও পবন্ধপঞ্জি

১. অশোক মিত্র সম্পাদিত, ১৯৯৯। *চতুরঙ্গ' থেকে*-২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

২. *নজরুল-রচনাবলী*-৯, ২০০৯। শতবর্ষসংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩. বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, ১৩৫১। 'কবিতা' নজরুল সংখ্যা, দশম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা।

৪. বুদ্ধদেব বসু, *সাহিত্যচর্চা*, ১৩৬১। প্রথম সংস্করণ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।

৫. বুদ্ধদেব বসু, ১৯৭৪। *কবিতার শত্রু ও মিত্র*, কলকাতা।

৬. *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সংগ্রহ*-১, ২০০৯। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ।

৭. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ২০০০। *বাঙালি কি আত্মঘাতী ও অন্যান্য রচনা*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।